10-3-50

বেষ্ট ফিল্মস-এর নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্রের

ইন্দিরা

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের অমর কাহিনী

* ইন্দিরা *

(প্রথম ও পঞ্চম সংস্করণ অবলম্বনে সত্যনিষ্ঠ চিত্রায়ন)

বেষ্ট ফিল্মসের শ্রদ্ধার্ঘ

প্রযোজনা—হরিভাই দাভে :
জটাশঙ্কর ঠক্কর
নাট্যরূপ ও অতিরিক্ত সংলাপ :
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গীতিকার : সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র,
আশা দেবী, গোবিন্দ চক্রবর্তী
নৃত্য-পরিকল্পনা : হিমাংশু রায়
তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণ : প্রভাস ভট্টাচার্য
স্থির-চিত্রায়ন : ষ্টীল ফটো সার্ভিস্
মৃৎশিল্পী : বিশ্বনাথ পাল
সুরসৃষ্টি : হরিপ্রসন্ন দাস
সঙ্গীত-অনুস্থতি : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
শিল্প-নির্দেশ : ভূপেন মজুমদার
সম্পাদনা : বিশ্বনাথ নায়ক
পরিস্ফুটনা : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীস্
ব্যবস্থাপনা : ননী মজুমদার, নৌতম শাহ্
রূপসজ্জা : রামু
সাজসজ্জা : নারায়ণ

চিত্রায়ন : রামানন্দ সেনগুপ্ত
সন্তোষ গুহ রায়
ঐ সহযোগী : তারক দাস
শব্দানুলেখন : সমর বসু
পরিবেশনা : বোম্বে পিকচার্স কর্পোরেশন

—সহকারী—

পরিচালনা : পিনাকী মুখোপাধ্যায়
চিত্রায়ন : অমিয় সেন
শব্দানুলেখন : দেবেশ ঘোষ,
মৃণাল গুহ ঠাকুরতা
সুরসৃষ্টি : সুপ্রভা সরকার
সম্পাদনা : গোবিন্দলাল চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশ : সুবোধ দাস
ব্যবস্থাপনা : বীরেন রায়, বৃন্দাবন দাস,
সদানন্দ চক্রবর্তী
রূপসজ্জা : সত্যেন ঘোষ
তড়িৎ নিয়ন্ত্রণ : কমল, ভীষ্ম, কেষ্ট,
নরেশ, রতিকান্ত

পরিচালনা : **অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়**

সহযোগী : **সুনীল মজুমদার**

রূপশ্রী ষ্টুডিয়োতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

রূপায়ণে

সন্ধ্যারাণী : সুনন্দা দেবী : কমল মিত্র : প্রভা : দীপক মুখোপাধ্যায় : জীবেন বসু : অমিতা বসু : নবদ্বীপ হালদার : মনোরমা (ছোট) : বিনয় মুখোপাধ্যায় : নিভাননী : শিশির বটব্যাল (এ্যাঃ) : রেবা দেবী : আশু বসু : তারা ভাদুড়ী : বাণীবাবু : কমলা অধিকারী : আদল চট্টোপাধ্যায় : আয়রণম্যান নীরোদ সরকার ও তাঁর সম্প্রদায় : দেবব্রত : বলাই : হাসি : বাবলু প্রভৃতি

★ ইন্দিরা ★

(কাহিনী-সংকেত)

আমি হরমোহন দত্তের মেয়ে ইন্দিরা। একুশ বছর বয়েসে, ভরা যৌবনে আমি প্রথম শ্বশুর-বাড়ী চলেছিলাম। রূপে, ঐশ্বর্যে আর সুখে সামনের ওই ধূ ধূ করা মাঠ পর্যন্ত যেন আমার চোখে স্বপ্নের ছায়াপথ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু সামনে পড়ল ডাকাতে কালাদীঘি।

ওর কালো ছলছলে গভীর জলে আমার যে সর্বনাশ লুকিয়ে ছিল সে কি আমি জানতাম! আমি কি জানতাম আমার সুখের স্বপ্নে নীল আকাশ চিরে এমন করে বজ্র নেমে আসবে।

ডাকাতের হাতে পড়লাম।

গায়ের গহনা, পরণের শাড়ী আর জীবনের সব কিছু স্বপ্ন কেড়ে নিয়ে আমায় গভীর জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে গেল তারা। রাজরাণী হতে চলেছিলাম—ভিখারিণীর ছিন্নবেশে অরণ্যের ভেতরে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

কিন্তু মরতে পারলাম কই! দুঃখের এই চরম মুহূর্তে পৃথিবীও যে আমায় অবহেলা করল! বাঘের ডাক শুনলাম, কিন্তু সে তো আমায় খেতে এলনা! ঝরা-পাতার আড়াল থেকে ফণা তুলে ছোবল দিলনা বিষধর সাপ, আমার ভয়ে বনের হিংস্র ভালুকও পালিয়ে গেল।

না, না, মরতে পারব না! অন্তত শেষবার স্বামীর মুখখানা না দেখে আমি মরতে পারবনা!

* * * *

মানুষ আমার সুখের সংসারে আগুন দিয়েছিল। আবার সেই মানুষের কাছেই আমি পেলাম আশ্রয়। পেলাম সান্ত্বনা, পেলাম সহানুভূতি, পেলাম ভালবাসা। ভগবানের পৃথিবীতে সবই তাহলে অভিশাপ নয়।

আশ্রয় জুটল বই কি, আমি হরমোহন দত্তের মেয়ে ইন্দিরা—টাকার গদীতে শুয়ে ঘুমোতে চেয়েছিলাম। আজ অদৃষ্টের নিষ্ঠুর কৌতুকে আমায় দাসীবৃত্তি নিতে হল কলকাতার রামরাম দত্তের বাড়ীতে।

তবু মরুভূমিতে আছে পান্থপাদপ; দুর্যোগের ঘন মেঘের আড়ালে আছে এক ফালি চাঁদের আলো।

সে আর কেউ নয় রামরাম দত্তের পুত্রবধূ সুভাষিণী।

অমন মানুষ কি হয়? বুক ভরা স্নেহ দিয়ে, প্রাণ ভরা ভালোবাসা দিয়ে আমার সব জ্বালা সে জুড়িয়ে দিলে। তারপর একদিন ধরে বসল, কুমুদিনী, তোমার সত্যিকারের পরিচয় দিতে হবে।

কুমুদিনী! হ্যাঁ—ওই নামই নিয়েছিলাম। কী হবে ইন্দিরাকে মনে রেখে? ডাকাতে যাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল—সমাজে তার স্থান কই?

ভেবেছিলাম, কোনোদিন কাউকে নিজের কথা বলবনা। এমনিভাবেই নিঃশব্দে চিরদিনের মত অন্ধকারে হারিয়ে যাবো।

সুভাষিণীর প্রশ্নে চোখ ফেটে আমার জল এল।

—কী লাভ বোন। কী হবে পরিচয় দিয়ে?

কিন্তু সুভাষিণী মানেনা। বলতেই হল। বুকের রক্তে রাঙিয়ে রাঙিয়ে জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তাকে শোনালাম।

তারও চোখে জল এল। দু ফোঁটা জল। আমার দুঃখে আরো একজনের চোখ অশ্রুকরুণ হয়ে ওঠে—এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আমার আর কী আছে!

* * * *

কিন্তু এ কী হল! আমি কি স্বপ্ন দেখছি! বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ছিঁড়ে যেতে চাইছে আমার শিরা-উপশিরাগুলি। ওগো, আনন্দের এই অসহ্য যন্ত্রণা আমি বইব কী করে।

আমার স্বামী!

না, না কখনো ভুল দেখিনি। আট বছর আগে বাসর রাত্রিতে একদিন মাত্র তাঁকে দেখেছিলাম, কিন্তু এক লহমার দেখা হলেও স্বামীর মুখ যে মেয়েদের বুকে চিরদিনের মতো আঁকা হয়ে যায়। আমার স্বামী রামরাম দত্তের বাড়ীতে অতিথি, আর আমাকেই রাঁধুনীবেশে তাঁকে পরিবেশন করতে হচ্ছে।

তিনি আমায় চিনলেননা, কিন্তু আমার রূপের ওপর তাঁর দৃষ্টি এসে ভ্রমরের মতো আটকে রইল। বুঝলাম, আমার চটুল কটাক্ষের আঘাত সহ্য করবার মতো শক্তি নেই—সামান্য একটু ইঙ্গিতেই আমার পায়ের তলায় এসে লুটিয়ে পড়বেন!

আড়ালে ডেকে নিয়ে সুভাষিণী বললে, কেমন, আকাশের চাঁদ হাতে এনে দিয়েছি তো! এবার নিজের জিনিস নিজে বুঝে নাও।

—কিন্তু কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব হল ভাই?

সুভাষিণী হেসেই আকুল: বাঃ, উনি যে আমার স্বামীর মক্কেল। তোমার কাছে নাম শুনেই তো ওঁকে আমরা চিনতে পারলাম। তারপর মামলার একটা মিথ্যে ছল করে—

সবই তো বুঝলাম। কিন্তু কী করে আত্মপরিচয় দিই স্বামীর কাছে? কেমন করে গিয়ে বলব, আমিই সেই ডাকাতে কেড়ে-নেওয়া ইন্দিরা, আমায় তোমার বুকে তুলে নাও?

নিষ্ঠুর সমাজ সেখানে পথরোধ করে আছে রাক্ষসের মতো।

কিন্তু সামনে সরোবরের স্নিগ্ধ জল থাকতে তো তৃষ্ণায় বুক ফেটে মরতে পারব না। হারাণো মাণিক কুড়িয়ে পেয়ে তাকে আবার ধূলোয় ফেলে দেব কোন্ প্রাণে!

শুরু হল, জীবনের নিষ্ঠুরতম আত্মবঞ্চনার পালা। নামলাম কলঙ্কিত অভিনয়ে। ভাগ্যের জুয়াখেলায় বাজী ধরলাম নিজের সমস্ত ভবিষ্যৎকে।

কুলত্যাগিনী কুমুদিনীরূপে তাঁর চিত্ত-বিভ্রম ঘটালাম। পরস্ত্রীর ছদ্মভূমিকায় নারীর চরম লজ্জা মাথায় বয়ে স্বামীর সঙ্গে রামরাম দত্তের গৃহত্যাগ করলাম!

হোক মিথ্যা—হোক বঞ্চনা, তবু তো সব পেয়েছি। ইন্দিরা তিলে তিলে তুষের আগুনে জ্বলে মরছে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পান করছে কালকূট বিষ। কিন্তু কুলটা কুমুদিনী তো পাচ্ছে তাঁর অকৃত্রিম প্রেম, তাঁর উচ্ছ্বসিত সোহাগ, তাঁর সেবা, তাঁর যত্ন। কতকালের পিপাসা-কাতর মরুভূমির ওপর নেমেছে ভরা শ্রাবণের স্নিগ্ধ বর্ষণ!

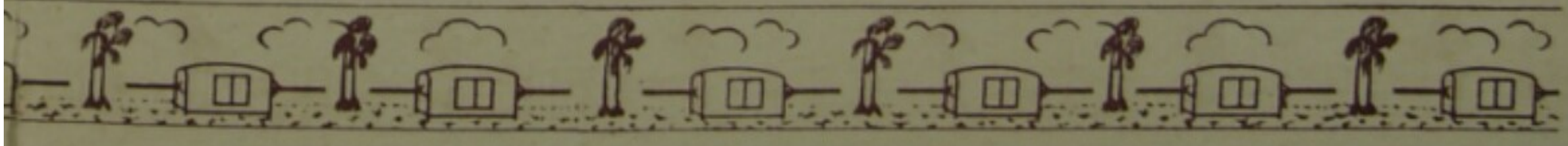

কিন্তু এ মিথ্যা সুখও বুঝি আর বেশীদিন সয়না! দেশ থেকে তাঁর ডাক এল। তাঁকে বাড়ী ফিরে যেতে হবে।

—আর আমি? আমার কী হবে?—বুক ফেটে আর্ত্তনাদ বেরুল আমার।

—তোমাকে ছেড়ে আমি বাঁচবনা। তুমি চিরকালের মতো আমার—তিনি আকুল কণ্ঠে জবাব দিলেন।

—পুরুষের আবার ভালোবাসা! শপথ করে ভাঙাই তো তার কাজ! তাঁর আত্মসম্মান আহত হল। পরদিন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে উইল করে দিলেন। বললেন, যদি কখনো তোমায় বঞ্চনা করি, এই উইল তার জামিন রইল।

* * * *

কিন্তু কী হবে এই উইলে?

ইন্দিরা কেমন করে সহ্য করবে কুলটা কুমুদিনীর এই জয়পত্র?

কুমুদিনী মরে যাক, পুড়ে যাক তার ছলাকলা নিয়ে, হারিয়ে যাক লজ্জার রাশি রাশি অন্ধকারে। এ উইল তার কলঙ্কের দলিল। কিন্তু আমি ইন্দিরা, আমার সতীত্ব, আমার প্রেম দিয়ে স্বামীকে কি কখনো আমি পাবোনা?

মিথ্যার মধ্য দিয়েই কি তিল তিল করে আমায় জ্বলে মরতে হবে? নিজের সত্য দিয়ে—স্ত্রীর মর্যাদায় স্বামীকে আমি ফিরে পাবোনা? আমার জীবনে কখনো কি আলো হয়ে উঠবেনা মর্ম্মজ্বালার এই দুঃসহ কালো রাত্রি?

ওগো, তোমরা কি এ প্রশ্নের উত্তর জানো? বলতে পারো, হতভাগিনী ইন্দিরার বাঁচবার পথ কোথায়?

●

• সঙ্গীতাংশ •

গ্রাম্য বালিকাদের গান

ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
বাঁশ তলাতে জল
আয় সই আয় জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

ঘাটটি জুড়ে গাছটি বেড়ে
ফুটল ফুলের দল
আয় সই আয় জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

বিনোদ বেশে মুচকে হেসে
খুলব হাসির কল
কলসী ধরে গরব করে
বাজিয়ে যাব মল
আয় সই আয় জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

গয়না গায়ে আলতা পায়ে
কল্কাদার আঁচল
চিমে চালে তালে তালে
বাজিয়ে যাব মল
আয় সই আয় জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

যত ছেলে খেলা ফেলে
ফিরবে দলে দল
কত বুড়ী জুজু বুড়ী
ধরবে কত ছল
মুচকে হেসে বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল
আয় সই আয় জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

রচনা : সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র

সুভাষিণীর গান

ধীরে ধীরে চল অভিসারে
তনু-যমুনার কুলে জোয়ার উঠেছে দুলে
ভীরু হিয়া কাঁপে বারে বারে ॥
গগনে বিজলী ওঠে চমকি চমকি
মৃদু পায়ে চল ধনী ঠমকি ঠমকি
দুরু দুরু উল্লাসে আকুলিত ঘনশ্বাসে
দোলা কেন লাগে মণিহারে ॥
কেন সখি চকিত নয়ন
তোমার সকল লাজ দেখনিকি ঢাকে আজ
তিমিরের ঘন আবরণ ॥
যদিগো কাঁকণ বাজে ঠনকি ঠনকি
ওঠে যদি কিঙ্কিনী রণকি ঝণকি
মরাল চরণ ছলে সাহসিকা যেও চলে
সঙ্কেত কুঞ্জের দ্বারে ॥

রচনা : আশা দেবী

ইন্দিরার গান

জনমে মরণে হে প্রিয় আমার
এইটুকু কথা রাখো
বিরহ-বেদনে ভরিয়া এ নিশি
তুমি আজ দূরে থাকো।

মম হৃদয়ের কাণায় কাণায়
যে প্রেম পুলক শিহরিছে হায়
সুধারসে তারে বিকশিতে দাও
হেলায় দলিয়ো নাকো।

প্রিয়ারে চাহিয়া পোহাক যামিনী
বিরহী চক্রবাক্
নিশীথ যমুনা তারি কাকলিতে
সকরুণ বয়ে যাক।

তবু জেনো প্রিয় প্রভাতের রবি
মধু-মিলনের আনিবে কি ছবি
দুখের দেয়ালী মরমে জ্বালিয়া
আজিকে প্রহর জাগো।

রচনা : আশা দেবী

সুভাষিণীর গান

আজি নূতন করিয়া কি দিব তোমারে
নিশিদিন তব শরণে
(ওগো) সুন্দর মম অন্তর ভরি
দেবতা জীবনে মরণে।

তুমি আমারি তুমি যে আমারি
মমমুগ্ধ ভুবনবিহারী
ধ্রুবতারা তুমি আঁধারে-আলোকে
বিরহে চির মিলনে।

আমি লতিকার সম জড়ায়ে জড়ায়ে
রহি গো তোমারি অঙ্গে
আমি ঝঞ্ঝার মাঝে প্রদীপের শিখা
সহচরী রহি সঙ্গে
যা কিছু আমার সবি তো তোমারি
সকলি দিয়াছি উজাড়ি
তবু আরো যদি চাও মোরে কিছু দাও
তাই তুলে দিব চরণে।

রচনা : গোবিন্দ চক্রবর্তী

ইন্দিরার গান

ওগো পথিক বন্ধু দাঁড়াও ক্ষণেক তরে
কোন মরীচিকা ডেকেছে তোমারে
সুদূর দিগন্তরে।

সরোবরে জাগে পিপাসার জল
মেলিয়া রেখেছি ছায়াতরুতল
তবু তুমি হায় দুরাশার পানে
চলেছ বেদনাভরে।

হে মরু-হরিণ, কোরনা ভুল
শ্যামল মাটির মিনতি শোন
মরু বালুকায় ফোটেনা ফুল।

মোর কারাগারে আমি বন্দিনী
ভাঙ্গো শৃঙ্খল লহ মোরে যিনি
আকাশগঙ্গা দেবেনা তো ধরা
তিয়াষী এ অন্তরে।

রচনা : আশা দেবী

কামিনী ও বালিকাদের সমবেত সঙ্গীত

পথ ভোলা গো পথ ভোলা
শেষ হ'ল কি আজকে ভুলের
দোল্ দোলা গো দোল্ দোলা।

রাজার মাণিক অন্ধকারে
লুকিয়ে ছিল পথের ধারে
হঠাৎ তারে কুড়িয়ে পেলে
তাই কি তোমার চোখ খোলা।

লক্ষ্যহারা পক্ষীরাজের
পাখ্না হঠাৎ থামল কি
তেপান্তরের মাঠের শেষে
অচিন দেশে নামল কি!
মরণ মোহে শয়ন ছেয়ে
ঘুমিয়ে ছিল রাজার মেয়ে
জাগিয়ে দিলে তাহার বুকেই
নূতন প্রাণের হিন্দোলা।

রচনা : আশা দেবী

বম্বে পিকচার্স কর্পোরেশনের পক্ষ হইতে শ্রীজটাশঙ্কর ঠক্কর কর্তৃক সম্পাদিত
ও ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা ৬, হইতে মুদ্রিত।